ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 13-19
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.429

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা

ড. বিপুল মণ্ডল, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 28.03.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Swami Vivekananda is one of the creators of modern India. He was a karmayogi, a patriot, and a social reformer. His entire sense of nationalism was shaped by a combination of emotion, patriotism, and social progress. Sister Nivedita said about Swamiji that his whole heart was filled with an intense longing—an overwhelming concern for India and its people. The idea of regarding human beings as divine already existed in the core of India's ancient civilization. However, it was never fully realized or widely practiced. Due to the rigid caste-divided social structure, as well as the dominance of orthodoxy and narrow-mindedness in Bengal, this ideal could not be properly implemented. Vivekananda dedicated himself to accomplishing this mission and entrusted Sister Nivedita with this responsibility as well.
The great ideal of "serving humanity as service to God" was not merely spoken by him; he was the first to attempt its practical realization on an all-India level. In the conventional sense, Swamiji was not a social scientist; he was a spiritual ascetic. However, he was exceptional because, unlike most spiritualists, he was not indifferent to the material world and its practical needs. Rather, alongside spiritual upliftment, he was equally active in searching for ways to improve the material and social conditions of society.
His search primarily began with exploring comprehensive methods for the reform and transformation of contemporary Indian society.

Keywords: Patriot, Social reformer, Spiritualism, Monk, India

১

স্বামী বিবেকানন্দ নব-ভারতের অন্যতম স্রষ্টা। তিনি ছিলেন একজন কর্মযোগী, দেশপ্রেমিক ও সমাজসংস্কারক। কর্মযোগ, দেশপ্রেম ও সমাজের প্রগতি মিলেই তৈরি হয়েছে বিবেকানন্দের জাতীয়তার সমগ্র সত্তাটি। ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজির সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর সমগ্র হৃদয় জুড়ে ছিল ব্যাকুলতা— ভারতবর্ষ ও তার মানুষকে নিয়ে ব্যাকুলতা। মানুষকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করার ধারণা ভারতের প্রাচীন সভ্যতার মর্মমূলে ছিলই। কিন্তু তা কখনই পরিব্যাপ্ত হয়নি। জাত-দীর্ণ সমাজ কাঠামোয় ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যজনিত গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। এ কাজ সম্পাদনে বিবেকানন্দ আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং নিবেদিতার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা'-র মহান আদর্শ শুধু ঠোঁটেই উচ্চারিত করেননি, তার বাস্তব রূপায়ণ সর্বভারতীয় স্তরে তিনিই প্রথম করতে পেরেছিলেন।

প্রথাগত অর্থে স্বামীজি সমাজ বিজ্ঞানী ছিলেন না, ছিলেন একজন অধ্যাত্মবাদী সন্ন্যাসী। কিন্তু তিনি ছিলেন

ব্যতিক্রমী, কারণ অধিকাংশ অধ্যাত্মবাদীদের মতো তিনি বাস্তব জগৎ ও তার বস্তুগত প্রয়োজন সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। বরং আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের জাগতিক উন্নতির পথ অনুসন্ধানেও তিনি সমান তৎপর ছিলেন। তাঁর এই অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল মূলত সমকালীন ভারতীয় সমাজের সার্বিক সংস্কার উত্তরণের উপায় অন্বেষণের মধ্য দিয়ে। ১৮৯৪ সালের ১৯ নভেম্বর আমেরিকা থেকে মাদ্রাজি অনুগামীদের এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

> "বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ... ভারতকে উঠাইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্যরূপ পাপ দূরীভূত করিতে হইবে। আরও খাদ্য, আরও সুযোগ প্রয়োজন।"[১]

২

বিবেকানন্দীয় সমাজ-ভাবনার ধর্মনিরপেক্ষ প্রাগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গি— এক বৈপ্লবিক আদর্শ। তিনি ভারতবর্ষের সমাজের সমস্যাকে অন্যান্য দেশনায়ক নেতাদের মতো শুধু রাজনৈতিক কথা ভাবেননি, সমস্যা যে সামাজিকও তা তিনি সম্যক উপলব্ধি করেছেন। অতি বলিষ্ঠ ভাবে সমাজতান্ত্রিকের চোখে তিনি দেখেছেন সমাজের সমস্যাকে। স্বামীজি বুঝেছিলেন, ভারতীয় সমাজে অন্যান্য সমস্যাগুলি অপেক্ষা জাতিভেদ প্রথা একটি প্রধান সমস্যা। এই জাতিভেদকে তিনি প্রথমেই বিলোপ করতে চেয়েছিলেন।

বিবেকানন্দের মতে ভারতের পতনের কারণ সংকীর্ণতা— যা ধ্বংস ও দুর্বলতার আকারে সমগ্র জাতির মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। বিবেকানন্দ বলেছেন—

> "আমার মনে হয় ভারতের দুর্গতি ও অধঃপতনের প্রধান কারণ জাতিভেদ, যাহার মূল কারণ হইল জাতিতে জাতিতে ঘৃনা ও বিদ্বেষ নিজে দুর্গত না হইলে অপরকে কেহ ঘৃণা করে না।"[২]

বর্ণগত অধিকারের প্রশ্নে স্বামীজিকে দীর্ঘকাল কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। স্বামীজি বরানগর মঠ থেকে ১৮৮৯ সালে প্রমদাদাসকে লেখা একটি চিঠির অংশ—

> "জন্মগত বর্ণভেদ ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে শূদ্রের অধিকার সম্বন্ধে।"[৩]

স্বামীজি তাঁর চিঠিতে বর্ণভেদ সম্পর্কে আরো উল্লেখ করেছেন— সে জন্মগতই হোক বা কর্মগত হোক তা কর্মভেদের শাস্ত্রীরা পটভূমির বিষয়ে তাঁর চূড়ান্ত অভিমত বলেই ধরে নেওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—

> "অপর এক মহা বিপ্রতিপত্তি— আমার দিন দিন দৃঢ় ধারনা (হইতেছে) এই যে, জাতি-বুদ্ধিই-মহাভেদকারী ও মায়ার মূল—জন্মগত বা গুণগত সর্বপ্রকার জাতিই বন্ধন। ... স্মৃতি পুরাণাদি সামান্যবুদ্ধি মনুষ্যের রচনাভ্রম, প্রমাদ, ভেদবুদ্ধি ও দ্বেষবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। ... জাতি ইত্যাদি উন্মত্ততা— যাতকদের লিখিত গ্রন্থেই পাওয়া যায়, ইশ্বর-প্রণীত গ্রন্থে নাই।"[৪]

বর্ণভেদ প্রথার বিরুদ্ধে স্বামীজির অভিযানের কেন্দ্র হল দুটি পৃথক অথচ পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়— অর্থনীতি ও ধর্ম। যে সামাজিক বিভেদের ফলে ভারতীয় সমাজে অগণিত নরনারী অধিকার বঞ্চিত ও দারিদ্রপিষ্ট তার জন্য স্বামীজি অন্তত প্রধান রূপে বর্ণভেদকেই দায়ী করেন। তিনি উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের, বিশেষত ব্রাহ্মণদের, নয়ী করেন পুরোহিততন্ত্র ও অস্পৃশ্যতার জন্য, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শাস্ত্রচর্চায় তাদের একচেটিয়া অধিকারের দাবির জন্য। খেতড়ির মহারাজার ভাষণের উত্তর দিতে গিয়ে স্বামীজি বলেছেন—

> "এই অসমতাই মানবপ্রকৃতিকে ধ্বংস করেছে, মানবজাতির উপরে অভিশাপরূপে নেমে এসেছে, এই অসমতাই সকল দুর্দশার মূলে। দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক— সকল প্রকার দাসত্বশৃঙ্খলের উৎসও এই অসমতা।"[৫]

১৮৯৪ সালে শিকাগো থেকে তাঁর গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা এক চিঠিতে তিনি আরও কঠোর ভাষায় একই অভিমত ব্যক্ত করে লিখেছেন—

> "ওরে ভাই, দক্ষিণ দেশে যা দেখেছি, উচ্চজাতির নীচের উপর যে অত্যাচার! মন্দিরে যে দেবদাসীদের নাচার ধুম! যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম? আমাদের কি আর ধর্ম? আমাদের 'ছুৎমার্গ, খালি আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না'। হে হরি! যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু-হাজার বছর খালি বিচার করছে— ডান হাতে খাব, কি বাম হাতে; ডান দিকে থেকে জল নেব, কি বাঁ দিক থেকে ... তাদের অধোগতি হবে না তো কার হবে? .. যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশ-বিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক! সে ধর্ম, না পৈশাচ নৃত্য।"[৬]

৩

বর্ণভেদ অপেক্ষাও স্বামীজিকে বেশি বিচলিত করেছিল— দরিদ্রের উপর ধনীর অত্যাচার, পীড়ন, লাঞ্ছনা দেখে। ভারতীয় পটভূমিতে এই অত্যাচার বর্ণভেদের সঙ্গে অসম্পৃক্ত নয়, কিন্তু প্রায়শই বর্ণভেদসীমা অতিক্রম করেও প্রসারিত। দরিদ্র ও অবহেলিতদের জন্য স্বামীজির দরদ তাঁর চরিত্রে একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তাঁর অনেক কর্মের মুখ্য প্রেরণা ছিল এই দরদ। তাঁর প্রথম আমেরিকাযাত্রার এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংগঠিত করার পিছনেও ছিল এই জনদরদ। ভারতের দরিদ্র ও দলিত জনগণের দুঃখদুর্দশার কথা যখন তিনি বলেছেন তখন তাঁর ভাষা হয়ে উঠেছে আবেগময়ী ও উদ্দীপক। তিনি একটি চিঠিতে মেরি হেলকে লিখেছেন—

> "আমি পরিকল্পনা করে কিছু করিনি, পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করেছি। আমার মাথায় একটাই চিন্তা সর্বন দীপশিখার মতো জ্বলজ্বল করেছে তা হল ভারতের জনগণকে উন্নত মানে পৌঁছে দেবার প্রক্রিয়াটি শুরু করা।"[৭]

ওই একই পরে স্বামীজি দরিদ্রদের দুটি অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন— খাদ্য ও শিক্ষা। তিনি লিখেছেন—

> "দরিদ্রের কর্মসংস্থানহেতু আধিভৌতিক সভ্যতার, এমন কি বিলাস সামগ্রীরও, প্রয়োজন আছে। অন্ন চাই। চাই। আমি এমন কোনো ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না যিনি আমাকে ইহলোকে অন্ন দিতে পারেন না অথচ পরলোকে শাশ্বত শান্তির আশ্বাস দেন। ভারতকে উন্নত করতে হবে, দরিদ্রের মুখে অন্ন জোগাতে হবে, শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে এবং অশুভ পুরোহিতন্ত্রকে বিনাশ করতে হবে...সকলের জন্য আরও অন্ন আরও সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।"[৮]

লাহোরে প্রদত্ত ভাষণে স্বামীজি বলেন—

> "আমাদের আধ্যাত্মিকতার তত প্রয়োজন নেই, বরং প্রয়োজন অদ্বৈতকে বস্তুজগতে খানিকটা নামিয়ে আনা। আগে অন্ন, তারপর ধর্ম। যারা অনাহারে দিন কাটাচ্ছে তাদের আমরা ধর্মোপদেশ শুনিয়ে যাচ্ছি। ধর্মমতবাদে কি পেট ভরে?"[৯]

৪

ভারতের জনাধারণের উন্নতিকল্পে স্বামীজি শিক্ষার উপরে বিশেষ জোর দিতেন। তিনি চেয়েছেন যে জীবনের সকল দিকই যেন শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় যাতে শিক্ষাদ্বারা ব্যক্তির ভৌতিক, বৌদ্ধিক ও আত্মিক উন্নতি একযোগে সাধিত হয়। সর্বোপরি তিনি চেয়েছেন এমন শিক্ষা যাতে মানুষ তৈরি হবে। এই শিক্ষার লক্ষ্য হবে চরিত্রগঠন, জনসাধারণের হারানো ব্যক্তিত্বের পুনরুদ্ধার এবং তাদের আপন ঐশ্বরীয় সম্ভাবনায় বিশ্বাসের

পুনরুজ্জীবন। সমাজসংস্কারের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও স্বামীজির নীতি ছিল উপর থেকে জোর করে। কিছু চাপিয়ে না দেওয়ার। মহীশূরের মহারাজকে তিনি লিখেছেন—

> "নিম্নশ্রেণীর আমরা সেবা করতে পারি একমাত্র শিক্ষাদান করে যার দ্বারা তাদের হারানো ব্যক্তিত্ব আবার বিকশিত হয় ...। তাদের ভাবতে শেখাতে হবে, বিশ্ব জুড়ে তাদের চার পাশে কি ঘটছে তারদিকে চোখ মেলে তাদের দেখতে হবে, তারপরে তারা নিজেরাই নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজে নিতে পারবে। ভাবতে শেখান, ব্যস, ওইটুকু সাহায্যই তাদের দরকার, বাকিটা তার ফলস্বরূপ আপনিই হবে। আমাদের কাজ শুধু রাসায়নিক উপাদানগুলোকে একত্র করে দেওয়া, প্রকৃতির নিয়মেই তারা দানা বাঁধবে। আমাদের কাজ জনগণের মাথায় ভাবনা ভরে দেওয়া, বাকিটা তারা নিজেরাই করবে।"[১০]

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে স্বামীজির দৃষ্টিভঙ্গি নারীর ধিকারের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া। তিনি ভেবেছন নারীদের সুশিক্ষিত করতে হলে প্রয়োজন মতো বিদ্যালয় গঠন করতে হবে এবং সকল নারীকে শিক্ষাঙ্গনে অবৈতনিক পড়ার সুযোগ করে দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে নারীদের শিক্ষা হলে সমাজের জাগরণ হবে। শিক্ষার আলো পেলে সমাজের অন্ধকার কুসংস্কার দূর হয়ে নতুন ঊষার আলোতে বিকশিত হবে।

ভারতে প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি বলেছেন—

> "নারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্য করাকে স্বামীজী এক অপছন্দ করতেন তার কারণ এটা তাঁর দুটি প্রধান বিশ্বাসের বিরোধী ছিল। প্রথমত তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে লিঙ্গভেদহেতু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদজ্ঞান চূড়ান্ত বিচারে অযৌক্তিক। তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তিই বস্তুতপক্ষে এক সর্বব্যাপী ব্যক্তিত্বের অংশ তাঁর গুরুভাইদের তিনি লিখেছেন, এই লিঙ্গভিত্তিক ভেদজ্ঞান নির্মূল না করা পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না। পুরুষ ও নারীতে কি প্রভেদ। সকলেই একই পরমাত্মার অংশ।"[১১]

নারীর অবস্থার উন্নতিকল্পে স্বামীজীর অনুপ্রেরণার দ্বিতীয় উৎস তাঁর অধিকারবাদ-বিরোধিতা। এই অধিকারবাদই সর্ববর্ণের নারীগণকে একত্রে শূদ্রগণের সমপর্যায়ভূক্ত করে শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অন্যান্য ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। এই আচরণকে স্বামীজি ন্যায়সঙ্গত বা হিন্দুদের প্রামাণিক শাস্ত্রানুমোদিত মনে করতেন না। তাঁর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মেয়েদের সম্বন্ধে ধর্মীয় বাধানিষেধের উল্লেখ করলে স্বামীজি বলেন—

> "কোন শাস্ত্রে এমন কথা আছে যে, মেয়েরা জ্ঞান-ভক্তির অধিকারিণী হবে না? ভারতের অধঃপতন হ'ল ভটচায়-বামুনরা ব্রাহ্মণেতর জাতকে যখন বেদপাঠের অনধিকারী ব'লে নির্দেশ করলে, সেই সময়ে মেয়েদেরও সকল অধিকার কেড়ে নিল। নতুবা বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগে দেখতে পাবি—মৈত্রেয়ী গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া মেয়েরা ব্রহ্মবিচারে ঋষিস্থানীয়া হয়ে রয়েছেন। ...এ-সব আদর্শস্থানীয় মেয়েদের যখন অধ্যাত্মজ্ঞানে অধিকার ছিল, তখন মেয়েদের সে অধিকার এখনই বা থাকবে না কেন? ... মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে-দেশ—সে-জাত কখনও বড় হতে পারেনি, কস্মিন কালে পারবেও না।"[১২]

নারীদের সন্ন্যাসগ্রহণে বাধাদানেরও স্বামীজি বিরোধী ছিলেন। তাঁর বড় আশা ছিল শ্রীমায়ের পরিচালনায় নারীদের জন্য একটি মঠ প্রতিষ্ঠার। পূর্বোক্ত শিষ্য যখন এই বলে আপত্তি করেন যে বুদ্ধের যুগে ছাড়া প্রাচীন ভারতে কখনও কোনও মঠ ছিল না, স্বামীজি তখন তাঁকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন যে সে আপত্তি নিরাধার এবং নারীদের জন্য মঠ প্রতিষ্ঠার তাঁর পরিকল্পনা শিষ্যকে সবিস্তারে বুঝিয়ে বলেন। বস্তুত স্বামীজি প্রায়ই

বলতেন যে পুরুষদের অপেক্ষাও মেয়েদের মঠ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। তিনি স্বামী শিবানন্দকে লিখেছেন—

> "শক্তিকে বাদ দিয়ে বিশ্বের পুনর্জাগরণ সম্ভব নয়। ভারতে সেই বিস্ময়কর শক্তিকে জাগ্রত করতেই শ্রীমায়ের আবির্ভাব। তাঁকে কেন্দ্র করে গার্গী মৈত্রেয়ীর আবার এই সংসারে আবির্ভূত হবেন। তাই আমি আগে চাই তাঁর সেই মঠ। আগে মাতা ও তাঁর কন্যারা, তারপরে পিতা ও তাঁর পুত্রেরা।"[১৩]

ভারতের জনসাধারণের উন্নতিকল্পে স্বামীজি শিক্ষার উপরে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছেন যে জীবনের সকল দিকই যেন শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় যাতে শিক্ষা দ্বারা ব্যক্তির ভৌতিক, বৌদ্ধিক ও আত্মিক উন্নতি এক যোগে সাধিত হয়। সর্বোপরি তিনি চেয়েছেন এমন শিক্ষা যাতে 'মানুষ' তৈরি হবে।

স্বামীজির আরেক ভাবনা ছিল সমাজে নারীদের অবস্থান, অধিকার এবং নারীশিক্ষার প্রসার। এ প্রসঙ্গে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে তিনি লিখেছেন—

> "নারীদের অবস্থার উন্নতি না করে বিশ্বের মঙ্গলসাধন করা সম্ভব নয়। কোন পাখি একটি ডানা নিয়ে উড়তে পারে না।"[১৪]

৫

ভারতবর্ষের জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা স্বামীজিকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। সাধারণ মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন তথা ভারতীয় সমাজের পুনরুজ্জীবনের পথ খুঁজতে তিনি উতলা হয়ে উঠেছিলেন। এজন্য তিনি রীতিমত একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে অর্থ ও মানবসম্পদ সংগ্রহ থেকে শুরু করে সংগঠিত সমাজ কল্যাণকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত নানা নীতি তথা সমাজ-সংস্কারে ধর্মীয় আদর্শের কুশলীপ্রয়োগ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর মাদ্রাজি শিষ্যদের কাছে তিনি লিখেছেন—

> "অনুভব কর, বৎসগণ, হৃদয় দিয়ে অনুভব কর; দরিদ্র, অজ্ঞান, দলিত জনগণের দুঃখ আপন হৃদয়ে অনুভব কর; তাদের দুঃখ হৃদয়ে ধারণ কর যতক্ষণ না হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে আসে, যতক্ষণ না চিত্ত বিকল হয়, যতক্ষণ না মনে হয় তুমি পাগল হয়ে যাবে—তারপরে ঈশ্বরের চরণে আপন আত্মাকে উৎসর্গ করে দাও। তখন পাবে শক্তি, পাবে ঈশ্বরের সহায়তা, পাবে অদম্য কর্মোৎসাহ...।"[১৫]

সমাজসংস্কারের কাঙ্ক্ষিত পদ্ধতি প্রসঙ্গে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করতে গিয়ে স্বামীজি এক বক্তৃতায় বলেছেন—

> "আমাদের পার্থক্য কেবল সংস্কারের পদ্ধতিতে। সমাজ সংস্কারকদের পদ্ধতি ধ্বংসের, আমার পদ্ধতি গঠনের। আমি সাময়িক সংস্কারে বিশ্বাসী নই, আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী।"[১৬]

সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে বাঁধাধরা পদ্ধতিতে স্বামীজি বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি মনে করেছেন আগে মানুষের সেবা করতে হবে, তাদের সার্বিকভাবে শিক্ষায় বিকশিত করতে হবে, তাদের মানসিক বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করতে হবে। তবে তাহল ব্যক্তিত্বের উন্নয়নে সাহায্য করা। ব্যক্তির উন্নতি হলে জাতির উন্নতি হবে, জাতির উন্নতি হলে সমাজের উন্নতি হলে দেশের উন্নতি হবে, আর দেশের উন্নতি হলে রাষ্ট্রের উন্নতি ক্রমবিকশিত হবে। তাহলে পরিপুরক গতিতে ভারতবর্ষের সমাজের সংস্কার পরিপূর্ণতার পথ খুঁজে পাবে। যেহেতু বিবেকানন্দের সমাজ দর্শনের কেন্দ্র ছিল জনগণের মুক্তি, সেজন্য তিনি জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ কর্ণধাররূপে মানবজাতির দাসত্ব শৃঙ্খললোচন করে আদর্শ মানুষ সমাজ দেশগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

৬

সংগঠিত সমাজকল্যাণ উদ্যোগের সার্থক রূপায়নের ক্ষেত্রেও স্বামীজির কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ছিল। প্রথমত, সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নতিকেই যে কোন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিবেকানন্দ ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে এক চিঠিতে লিখেছেন—

> "আমাদের মিশন (কার্য) হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভূষোর জন্য, আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে তো ভদ্রলোকের জন্য।"[১৭]

দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের উন্নতির প্রধান উপায় তাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য শিক্ষাদান, কেবল সাহায্য বিতরণ নয়। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামী শুদ্ধানন্দকে এক চিঠিতে এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

> "অখণ্ডানন্দ মহুলাতে অদ্ভুত কর্ম করেছ বটে, কিন্তু কার্য-প্রণালী ভাল বলে বোধ হচ্ছে না। মনে হয় তারা একটা গ্রামেই তাদের শক্তিক্ষয় করছে, তাও কেবল চাল বিতরণের কার্যে। ... জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না।" [১৮]

তৃতীয়ত, সমাজে পিছিয়ে পড়া অংশের উন্নতির জন্য তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইয়া তোলাই কর্তব্য বলে উল্লেখ করে এই কাজে শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণীকে 'অনুঘটক'-এর ভূমিকা নিতে হবে বিবেকানন্দ মনে করতেন। তিনি বলেছেন—

> "আমাদের কর্তব্য কেবল রাসায়নি উপাদানগুলিকে একত্র করা—অতপর প্রাকৃতিক নিয়মেই উহা দানা বাঁধিবে। ... কেবল তাহাদের মাথায় কতকগুলি ভাব প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া, বাকি যাহা কিছু তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে।"[১৯]

চতুর্থত, শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণী যেন সমাজের প্রান্তিক মানুষের প্রতি দয়া নয়, যথার্থ দায়বোধ থেকে সমাজ-কল্যাণব্রতে যোগ দেন। এই দায়বোধের কথা স্বামীজি বারবার শিষ্যদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে এক চিঠিতে লিখেছেন—

> "যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি।"[২০]

৭

ভারতীয় সমাজের জাগরণের জন্য বিবেকানন্দের পরিকল্পনা এবং চিন্তা মানবসমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে অভিমুখগুলিকে আমরা নিম্নোক্ত রূপে চিহ্নিত করতে পারি—

প্রথমত, কোন সমাজের উন্নয়নের মাত্রা জনসাধারণের তথা সমাজের চেয়ে পিছিয়ে পড়া অংশের অবস্থার নিরিখে নির্ধারিত হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, চরিত্র গঠন ও মানুষ তৈরির শিক্ষাই প্রকৃত ক্ষমতায়নের হাতিয়ার। তাই সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে গণশিক্ষার প্রসারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

তৃতীয়ত, সামাজিক হস্তক্ষেপের পদ্ধতি হবে উর্ধ্বগামী—অধোগামী নয়।

চতুর্থত, মানুষ জতিভেদ ভুলে গিয়ে পরস্পরকে উন্নয়নের পথে সহায়তা করবে, কিন্তু প্রত্যেককে সমাজেরই স্বনির্ধারিত ও স্বকীয় পন্থায় আত্মবিকাশের অধিকার থাকবে।

পঞ্চমত, বিকাশ প্রক্রিয়া সবসময়ই সকল মানুষের আধ্যাত্মিক একতার আদর্শে প্রাণীত হবে, কেবল উপযোগিবাদী স্বার্থবাহী নীতিচালিত নয়।

সবশেষে বলা যায়, সার্বিকভাবে মানুষের মঙ্গল, দরিদ্রের মুখে অন্নদান, উপযুক্ত শিক্ষাদান, নারীশিক্ষার প্রসার এবং অধিকার, মানুষকে জীব সেব রূপে শিব সেবা এবং কর্মের সংস্থান গড়ে তোলাই স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ-সংস্কারের মূল লক্ষ্য ছিল।

ভারতীয় সমাজ সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের পন্থা অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিবেকানন্দ সমাজ বিকাশের এমন কতগুলি সাধারণ নীতি ও আদর্শের আবিস্কার করেছিলেন, যা কেবল তাঁর সমকালীন ভারতীয় সমাজে নয়, গোটা মানবসমাজেরই সুসামঞ্জস্য বিকাশের ক্ষেত্রে আজও প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র:

১. স্বামী বিবেকানন্দ। পত্রাবলী। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রকাশকাল ২০০০, পৃ. ২২৩।
২. তদেব, পৃ. ২২৫।
৩. লেটারস অব স্বামী বিবেকানন্দ, অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৬৪, পৃ. ৬-৮।
৪. তদেব, পৃ. ৪০০-৪০১।
৫. কমপ্লিট ওয়ার্কস অব স্বামী বিবেকানন্দ, অদ্বৈত আশ্রম, প্রকাশকাল-১৯৭০, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৯।
৬. তদেব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫৩-২৫৪।
৭. লেটারস অব স্বামী বিবেকানন্দ, অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৬৪, পৃ. ৪১৫।
৮. কমপ্লিট ওয়ার্কস অব স্বামী বিবেকানন্দ, অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৭০, ৪র্থ খণ্ড পৃ. ৩৬৫।
৯. কমপ্লিট ওয়ার্কস অব স্বামী বিবেকানন্দ, অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৭০, ৩য় খণ্ড পৃ. ৪৩২।
১০. লেটারস অব স্বামী বিবেকানন্দ, অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৬৪, পৃ. ১৪০।
১১. কমপ্লিট ওয়ার্কস অব স্বামী বিবেকানন্দ, অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৭০, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৭২-২৭৩।
১২. কমপ্লিট ওয়ার্কস অব স্বামী বিবেকানন্দ, অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৭০, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২১৪-২১৫।
১৩. তদেব, পৃ. ২১৯-২২০।
১৪. অমৃতলোক, ৩৭ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ. ৩৪৩।
১৫. কমপ্লিট ওয়ার্কস অব স্বামী বিবেকানন্দ, অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৭০, ৭ম খণ্ড পৃ. ৪৮২।
১৬. কমপ্লিট ওয়ার্কস অব স্বামী বিবেকানন্দ, অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৮৪, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২১৩।
১৭. স্বামী বিবেকানন্দ। পত্রাবলী। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রকাশকাল-২০০০, পৃ. ৬৯৬।
১৮. স্বামী বিবেকানন্দ। পত্রাবলী। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রকাশকাল-২০০০, পৃ. ৫৭৫।
১৯. স্বামী বিবেকানন্দ। পত্রাবলী। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রকাশকাল-২০০০, পৃ. ১৪৯।
২০. স্বামী বিবেকানন্দ। পত্রাবলী। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রকাশকাল-২০০০, পৃ. ২৬৮-২৬৯।